ধর্ষণের ভিকটিম বিচার চেয়ে বিচারকার্যে ৪ বার ধর্ষণের শিকার হন!

সিরাজ প্রামাণিক

আমাদের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারায় ধর্ষণের ব্যাখায় বলা হয়েছে, যদি কোনো পুরুষ বিবাহবন্ধন ছাড়া ষোলো বছরের অধিক বয়সের কোনো নারীর সাথে তার সম্মতি ছাড়া বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তার সম্মতি আদায় করে অথবা ষোলো বছরের কম বয়সের কোনো নারীর সাথে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ছাড়া যৌন সঙ্গম করেন, তাহলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

ধর্ষণের সংজ্ঞা থেকে আমরা যা পাই তা হলো– (১) ভিকটিমের বয়স ১৬ বছরের নিচে হতে হবে, (২) তার যৌনকর্মে সম্মতি থাকলেও ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে, (৩) যিনি ওই ভিকটিমের সঙ্গে যৌনকর্ম করেছেন তিনি ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং এজন্য তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। সম্প্রতি ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট হানিফ সেখ বনাম আছিয়া বেগম মামলায় (যা ৫১ ডিএলআরের ১২৯ পৃষ্ঠায় এবং অন্য একটি মামলায়, যা ১৭ বিএলটিএর ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে) বলেছেন যে, ১৬ বছরের অধিক কোনো মেয়েকে যদি কোনো পুরুষ বিয়ের প্রলোভন দিয়ে যৌনকর্ম করে তা হলে তা ধর্ষণের নামান্তর হবে না।

আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সোহেল রানা বনাম রাষ্ট্র মামলায় (যা ৫৭ ডিএলআরের ৫৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে) বলেছেন, যৌনকর্মের সময় যদি ভিকটিম কোনোরূপ বাধা না দেয় অথবা বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করে অথবা কোনো চিৎকার না দেয় তাহলে ধর্ষণ হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। এসব ক্ষেত্রে যৌনকর্মে ভিকটিমের সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে।

আমাদের দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো পুরুষ নিম্নোক্ত পাঁচটি অবস্থার যে কোনোটিতে কোনো নারীর সাথে যৌন সঙ্গম করে তাহলে সে ধর্ষণ সংঘটন করেছে বলে গণ্য হবে : ১) নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে; ২) নারীর সম্মতি ছাড়া; ৩) মৃত্যু বা জখমের ভয় দেখিয়ে সম্মতি নিয়ে; ৪) নারীর সম্মতি নিয়েই, কিন্তু পুরুষটি জানে যে সে ঐ নারীর স্বামী নয় এবং পুরুষটি তাও জানে, নারীটি তাকে এমন একজন পুরুষ বলে ভুল করেছে যে পুরুষটির সঙ্গে তার আইনসঙ্গতভাবে বিয়ে হয়েছে বা বিবাহিত বলে সে বিশ্বাস

করে; ৫) নারীর সম্মতিসহ কিংবা সম্মতি ছাড়া যদি সে নারীর বয়স ১৪ বছরের কম হয়। ব্যতিক্রম : ১৩ বছরের কম নয় এমন স্ত্রীর সাথে স্বামী যৌন সঙ্গম করলে ধর্ষণ বলে গণ্য হবে না। এখানে কোথাও বলা হয় নি একাধিক বিয়ে হয়েছে বা কুমারী নয় এমন নারী ধর্ষণ সংজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবেন। এমনকি এই আইন যৌনকর্মীদের জন্যও প্রযোজ্য যদি সে তা প্রমাণ করতে পারে।

এবার আসল কথায় আসি। আমার এ লেখাটি মূলত ধর্ষণের শিকার একজন নারী বিচার চাইতে গিয়ে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই আবারও যে জনসমক্ষে ধর্ষণের শিকার হন, সে বিষয়টি তুলে ধরা। আমাদের সাক্ষ্য আইনে ১৫৫ ধারার ৪ উপধারার সুযোগে ধর্ষক সাধারণত ধর্ষণের শিকার বা ভিকটিমকে 'কুচরিত্রা' প্রমাণের চেষ্টা করে থাকেন। এর কারণ হচ্ছে ঐরূপ প্রমাণ করতে পারলেই ধর্ষক ধর্ষণের অভিযোগ থেকে বেঁচে যেতে পারেন। এ ধারায় বলা আছে যে, কোনো ব্যক্তি যখন ধর্ষণ বা বলাৎকার চেষ্টার অভিযোগে ফৌজদারিতে সোপর্দ হন, তখন দেখানো যেতে পারে যে অভিযোগকারিণী সাধারণভাবে দুশ্চরিত্রা। এ সুযোগে ধর্ষণের মামলায় জেরা করার সময় ধর্ষণের শিকার নারীকে অনেক সময় অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রাসঙ্গিক, রুচিহীন ও আপত্তিকর প্রশ্নের মাধ্যমে চরিত্র হনন করা হয়। এ কারণে ধর্ষণের শিকার নারী ও তাঁর পরিবার মামলা করতে নিরুৎসাহিত হন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। এ দিকটির নেতিবাচক বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে ভারতের মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। State of Punjab v. Gurmit Singh; (1996) 2 SCC 384 মামলায় অভিযুক্তপক্ষ কর্তৃক ভিকটিমকে জেরা করার সময় আদালতের দায়িত্ব সম্পর্কে কোর্ট যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

"সাক্ষ্য আইনে ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বিধান যাই থাকুক না কেন, আসামিপক্ষের কিছু কৌসুলি রয়েছেন যারা ধর্ষণের বিস্তারিত সম্পর্কে ধর্ষিতাকে অনবরত প্রশ্ন করার কৌশল গ্রহণ করে থাকেন। ধর্ষণ ঘটনা বিষয়ে ধর্ষিতাকে বারবার বিস্তারিত উত্তর দিতে হচ্ছে সঠিক ঘটনা তুলে ধরতে নয় এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করতেও নয়, বরং অভিযোগের সাথে তার দেয়া সাক্ষ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখানোর জন্য। ফলে আসামিপক্ষ কর্তৃক ধর্ষিতাকে জেরা করার সময়ে আদালতের নীরব দর্শকের মতো বসে থাকা উচিত নয়। অবশ্যই কার্যকরভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অভিযোগকারীর সত্যনিষ্ঠা এবং তার সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা জেরা করার মাধ্যমে যাচাই করার জন্য অভিযুক্তকে যেমন স্বাধীনতা দেয়া উচিত, তেমনিভাবে আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ধর্ষিতাকে হয়রানি বা অবমানিত করার জন্য জেরা করা হচ্ছে না। স্মরণ রাখতে হবে, ধর্ষণের শিকার নারী ইতোমধ্যে দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং তাকে যদি ঐ অপরিচিত ঘটনার শিকার হওয়া নিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তাহলে সে লজ্জায় নির্বাক হয়ে থাকতে পারেন এবং

তার নীরবতাকে ভুল করে সাক্ষ্যের 'অমিল এবং স্ববিরোধ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকতে পারে।"

তবে আমাদের সাক্ষ্য আইন ভিকটিম ও তার সাক্ষীকে আপত্তিকর, অনভিপ্রেত, অশোভন, লজ্জাজনক, আক্রমণাত্মক ও বিরক্তিকর প্রশ্ন করা থেকে সুরক্ষা প্রদান করেছে। সাক্ষ্য আইনের ১৫১ ও ১৫২ ধারা পাঠ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাক্ষী যাতে ভয় বা লজ্জা না পেয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে, সেজন্য নির্দিষ্ট কোনো মামলার প্রয়োজনে আদালত বিচার কার্যক্রম রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠান করতে পারেন। এখানে জেরায় বিরূপ কোনো প্রশ্ন থাকলে ধর্ষণের শিকার নারী সহজেই তার উত্তর দিতে পারবেন। কিন্তু জনাকীর্ণ আদালতে ভিকটিম নারীর পক্ষে সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ২০(৬) মতে, কোনো ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবা ট্রাইব্যুনাল স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করলে এই আইনের ধারা ৯-এর অধীন এর বিচার কার্যক্রম রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠান করতে পারবে।

সাক্ষ্য আইনে ইন্ডিয়া যেমন সংশোধন এনেছে, তেমনি আমাদের দেশের সাক্ষ্য আইনের ১৫৫-এর উপধারা ৪ বাদ দেয়া যুক্তিযুক্ত। এই ধারাটি আদালতের কাজে এলেও বর্তমানে ধর্ষিতার ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনাকীর্ণ আদালতে ভিকটিমকে হেনস্তা করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এই আইনকে। একজন ভিকটিম আদালতে বিচার চাইতে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আবারও ধর্ষণের শিকার হন। কারণ এ ধারা প্রয়োগ করলে ধর্ষণের শিকার নারীর অতীত যৌনজীবন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়, যা অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় একটি বিষয়। প্রতিপক্ষের আইনজীবী বারবার প্রমাণের চেষ্টা করেন যে ভিকটিম আসলে এ ধরনের যৌনসম্পর্কে অভ্যস্ত। খোদ একটি আইনের ধারাই যেখানে ভিকটিমকে দুশ্চরিত্রা হিসেবে উপস্থাপনের লাগামহীন সনদ দিয়ে দিচ্ছে, সেখানে ওই ভিকটিমকে অপমানিত হওয়া থেকে আদালত কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারবে না। এই ধারাটি ব্যাপকভাবে ধর্ষণের মামলাগুলোকে প্রভাবিত করে চলেছে। এমনকি অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করার পর এই ধারাটির কাঁধে ভর করে বেকসুর খালাস পাওয়ার উদাহরণও এই দেশে আছে।

বাংলাদেশের উচ্চ আদালতগুলোতে 'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' প্রমাণ হিসেবে কতটা ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর ফলাফলগুলো কী ছিল তা একটি উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আবদুল মজিদ বনাম রাষ্ট্র, ১৩ বিএলসি ২০০৮ মামলায় একজন তালাকপ্রাপ্ত মা, যিনি তার শিশুসহ কুঁড়েঘরে ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ করেছিলেন, পালিয়ে যাওয়ার সময় তার ধর্ষক গ্রামবাসীর কাছে ধরা পড়েন এবং অপরাধ স্বীকার করেন। আদালতে

অভিযোগকারিণীর বৈবাহিক অবস্থা এবং যৌনসম্পর্কের ইতিহাসকে তার 'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য' বিবেচনায় তাকে 'যৌন কার্যকলাপে অভ্যস্ত' বলে উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় 'ধর্ষিতা একজন হালকা নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী এবং তিনি অসামাজিক ও অনৈতিক কার্যক্রমে জড়িত রয়েছেন।'

রাষ্ট্র বনাম শাহীন এবং অন্যান্য, ২৮ বিএলডি (হাইকোর্ট ডিভিশন) ২০০৮ মামলায় ধর্ষণের অভিযোগকারিণীর দুবার বিয়ে হয়েছিল। তাকে তার নানির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি হোটেলের কক্ষে সদলবলে ধর্ষণ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও আদালতের রায়ে বলা হয় যে 'এটি এমন একজন নারীর ধর্ষণের মামলা, যার আগে দুবার বিয়ে হয়েছিল এবং এই মামলাটি এমন একটি উদাহরণ, যেখানে উল্লিখিত কারণে বাদিনীর একার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।'

শ্রী দিনটা পাল বনাম রাষ্ট্রের মামলায় (৩০ বিএলডি (এডি) ২০১০) দেখা যায়, আদালত অভিযোগকারিণীর গাছ বেয়ে ওঠাকেই তার 'খারাপ চরিত্র বা দুশ্চরিত্র'-এর নমুনা হিসেবে প্রমাণ করেন এবং তার সাক্ষ্যকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে ধরে নেন। অভিযোগকারিণী ছিলেন একজন অল্পবয়সী গৃহপরিচারিকা, যিনি তার নিয়োগকর্তার হাতে ধর্ষিত হন। আদালত এ ক্ষেত্রে মন্তব্য করেন যে, যেহেতু অভিযোগকারিণী অভিযুক্তের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ থাকার সময় একটি পেঁপেগাছ বেয়ে উঠে প্রবেশ করেছিলেন, এতে প্রমাণ হয় যে বাদিনী একজন হালকা সম্ভ্রমের নারী। তাই তার দেয়া প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না আরো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পেশ করা হবে।

ধর্ষণ মামলায় ভিকটিমের অতীত যৌন ইতিবৃত্ত সম্পর্কে অভিযুক্তের পক্ষ থেকে দেয়া সাক্ষ্য কতটুকু গ্রহণ করা যাবে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইন্ডিয়ান ল কমিশনের ৮৪তম রিপোর্টে (১৯৮০) বলা হয়েছে, ভিকটিমের অতীত যৌন ইতিবৃত্ত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার বিষয়টি লিগ্যাল সিস্টেম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ এবং আইনি-কার্যধারা থেকে অনীহা অনুভব করার অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

অবশ্য আদালতের এমন রায়ও রয়েছে যেখানে একজন ভিকটিমের সৎ চরিত্রের প্রমাণকেও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ফাতেমা বেগম বনাম আমিনুর রহমান মামলায় (২৫ বিএলডি (এডি) ২০০৫) আদালত সিদ্ধান্ত দেয় যে, 'বিজ্ঞ উকিল উপস্থাপন করেছেন যে মামলার বাদিনী একটি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের একজন অবিবাহিতা কলেজপড়ুয়া ছাত্রী। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নই ওঠে না যে বাদিনীর চরিত্র সন্দেহজনক হতে পারে।'

State of U.P. Vs. Pappu @Yunus & anr. AIR 2005 SC 1248 মামলায় ভারতের সুপ্রিমকোর্ট বলেন যে, যদি দেখানোও হয় যে মেয়েটি যৌন সঙ্গমে অভ্যস্ত, অভিযুক্ত ব্যক্তির ধর্ষণের দায় হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না। এটা প্রতিষ্ঠা

করতে হবে যে, ঐ নির্দিষ্ট ঘটনায় মেয়েটির সম্মতি ছিল। তা ছাড়া, ভিকটিমের শরীরে আঘাতের অনুপস্থিতিই অভিযুক্ত ব্যক্তির অব্যাহতি পাওয়ার কারণ হতে পারে না।

Indian Evidence Act ১৮৭২-এর নতুন সংযোজিত ধারা ৫৩-এর বিধান মতে, যৌন হয়রানি, বিবস্ত্র করা বা চেষ্টা করার জন্য বল প্রয়োগ, গোপন যৌনক্রিয়া অবলোকন, যোগাযোগের গোপন চেষ্টা ও শান্তি নষ্ট, যৌন আঘাত, যৌন আঘাত করে মৃত্যু বা বোধশক্তিহীন করা, সেপারেশনের সময়ে স্ত্রীকে যৌন আঘাত, সরকারি কর্মচারী, জেল বা রিমান্ড হোমে যৌন সঙ্গম, একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক একত্রে যৌন আঘাত, কৃত অপরাধের পুনরাবৃত্তি বা এগুলোর চেষ্টা সংক্রান্ত মামলায় ভিকটিমের সম্মতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে, সেক্ষেত্রে ভিকটিমের চরিত্র বা অতীত যৌন অভিজ্ঞতা বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক হবে না। ধারা ১৪৬-এ নতুন সংযোজিত অনুশর্তের বিধান মতে, যৌন আঘাত, যৌন আঘাত করে মৃত্য বা বোধশক্তিহীন করা, সেপারেশনের সময়ে স্ত্রীকে যৌন আঘাত, সরকারি কর্মচারী, জেল বা রিমান্ড হোমে যৌন সঙ্গম করা বা এগুলোর চেষ্টা সংক্রান্ত মামলায় ভিকটিমের সম্মতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে, সেক্ষেত্রে ভিকটিমের সাধারণ অনৈতিক চরিত্র বিষয়ে বা অতীত যৌন অভিজ্ঞতা নিয়ে সাক্ষ্য দেয়া এবং ভিকটিমকে জেরা করা যাবে না।

উল্লিখিত মামলাগুলো বিশ্লেষণ করলে এটার মধ্যে যথেষ্ট ঔপনিবেশিক আচরণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারার কার্যপ্রক্রিয়াটি স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। আমাদের প্রতিষ্ঠিত আইনি নীতি হলো– যদি ধর্ষণের শিকার নারী খারাপ চরিত্রের অধিকারীও হয়ে থাকেন এবং এমনকি যদি যৌনকর্মীও হয়ে থাকেন, তার গোপনতার অধিকার কোনো ব্যক্তি কর্তৃক খর্ব হতে পারে না এবং ভিকটিমের চরিত্র নির্বিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই ধর্ষণ অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হয়। পৃথিবীতে এমন কোনো সভ্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে আইনের বিকাশ হয় নি। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে 'আইন' ধারণাটিরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে আইন তার কার্যকারিতা হারায়। কাজেই প্রয়োজন হলে আইনকে সময় উপযোগী করে তোলা দরকার। গঠনমূলক সমালোচনার মধ্যেই আইন তার অস্তিত্বের সন্ধান পায়। কাজেই আমাদের সাক্ষ্য আইন ১৮৭২-এর ধারা ১৫৫-এর উপধারা ৪-এর বিধান বাদ দেয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

বিচারপতি গোলাম রাব্বানী স্যারের লেখা এক কেইস স্টাডি থেকে জানা যায়, ১৯ বছরের এক গরিব যুবতী গৃহবধূ সালমা। শীতের এক রাতে ওই গৃহবধূ পিতৃগৃহ থেকে রিকশায় চেপে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ঢাকার মিরপুরে সনি সিনেমা হলের কাছে পৌঁছালে চারজন লোক তাঁকে জোরপূর্বক রিকশা থেকে নামিয়ে অস্ত্রের মুখে এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

রিকশাওয়ালাকে মারলে ও ভয় দেখালে সে পালিয়ে যায়। এরপর সেখানে নিয়ে ড্রইংরুমের মধ্যে তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়। অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে তিনজনকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে ও অবশেষে ঢাকার তৃতীয় বিশেষ আদালতে তাদের বিচার করা হয়। আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ও আরো দাবি করে যে সালমা স্থানীয় প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় পতিতাবৃত্তি করে এবং এ অবৈধ কাজে বাধা দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এ মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।

আদালতে সালমা আরজির বিষয় বর্ণনা ও সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ওই ঘর থেকে পুলিশ টিভি, ভিসিআর, ক্যাসেট ও বন্দুক সিজ করে। সিজ করা টিভি ও বন্দুক কোর্টে প্রদর্শিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক সালমাকে পরীক্ষা করেন এবং তিনি আদালতে সাক্ষ্য দেন যে, সালমার পাঁজর, উরু, নিতম্বে আটটি জখম। অর্থাৎ ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া গেছে এবং তাঁকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়েছে। মামলায় আরো ছয়জন সাক্ষ্য দেন। তাঁরা হলেন এজাহারের লিপিকার দারোগা, থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা, একজন সহকারী দারোগা ও একজন কনস্টেবল। অপর দুজন সিজারলিস্টের সাক্ষী, যাঁদের উপস্থিতিতে ঘটনাস্থল থেকে টিভি, ভিসিআর, ক্যাসেট ও বন্দুক জব্দ করা হয়েছিল।

সাক্ষ্য ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে ওই বিশেষ আদালত আসামি তিনজনকে ধর্ষণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং জরিমানাসহ সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেন। এরপর দণ্ডপ্রাপ্তরা সাজার আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করে। বিচারপতি নঈমুদ্দিন আহম্মদ ও বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর দ্বৈত বেঞ্চে বসাকালীন আপিলটির শুনানি হয় এবং নিম্ন আদালতের রায়টি সঠিক আছে বলে ওই বেঞ্চ আপিলটি ডিসমিস করে দেন। সেই সাথে বিচারপতি গোলাম রাব্বানী মন্তব্য করেন যে, যেহেতু ভিকটিম নিজেই জখম হয়েছেন, কাজেই তাকে জখমি সাক্ষী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং ভিকটিমকে একজন সহযোগী ও অন্য সাক্ষী দ্বারা ঘটনা প্রমাণ করতে হবে এমন প্রাচীন আইনি ধারণা সঠিক নয়।

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রূপ রায় ও আদেশের প্রতি সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামিপক্ষ আপিল বিভাগে আপিল করে। আপিল বিভাগ প্রাচীন আইনি ধারণাটি অনুসরণ করে রায় প্রদান করেন। ওই রায়ে বলা হয়, 'এই মোকদ্দমার একমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী সালমা নিজেই ভিকটিম হওয়ায় এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে সালমা সত্য কথা বলেছে কি-না এবং তাঁর সাক্ষ্যের প্রত্যক্ষ বা অবস্থানগত সমর্থন প্রয়োজন কি-না।' অতঃপর সালমার ও অন্য সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে আপিল বিভাগ সালমাকে অবিশ্বাস করেন। ফলে আপিল বিভাগ ঢাকার তৃতীয় বিশেষ আদালতের রায় এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাতিল করেন ও

আসামি তিনজকে বেকসুর খালাস দেন। আপিল বিভাগের ওই রায়টি পরবর্তী সময়ে 'বাংলাদেশ লিগ্যাল ডিসিশনস'-এর ১৩০০ খণ্ডের ৭৯৮৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।'

আইনের ভাষায়, নারী ও শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা হলে অপরাধ প্রমাণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর প্রমাণ হিসেবে ডাক্তারি পরীক্ষার সনদপত্রকে বিবেচনা করা হয়। সনাক্তকৃত আলামত অভিযুক্তের কি-না তা প্রমাণ করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে। বাস্তবে নারী ও শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনসহ অন্যান্য শারীরিক নির্যাতন প্রতিকারে মেডিকেল পরীক্ষার ব্যবস্থা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়ক নয়। আইন বা রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা যথাযথভাবে পালিত না হওয়ার জন্যই ভিকটিমরা ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে একদিকে যেমন বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে অপরাধীরা উৎসাহিত বোধ করে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর জারিকৃত পরিপত্রে ধর্ষণ কিংবা অ্যাসিড বা এ জাতীয় অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও ডাক্তারি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান কার্যকর করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, পুলিশের রেফারেন্স ছাড়াও ধর্ষণ এবং অন্যান্য সহিংসতার শিকার কোনো নারী ও শিশু যে কোনো সরকারি স্থাপনায় কিংবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোনো বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে যথানিয়মে পরীক্ষা করবেন এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও নিকটস্থ থানায় প্রেরণ করাসহ, যাকে পরীক্ষা করবেন তাকেও ১ কপি প্রদান করবেন। চিকিৎসক ও তার ক্লিনিক্যাল সহকারীরা নির্যাতনের শিকার নারী বা শিশুকে যথাসাধ্য সেবা দেবেন।

কিন্তু দুঃখের সাথে জানাতে হয় এ নির্দেশনা মোটেই অনুসৃত হচ্ছে না। প্রথমত, নির্যাতনের শিকার কেউ হাসপাতালে গেলে থানার রেফারেন্স ছাড়া কর্তব্যরত ডাক্তার মেডিকেল পরীক্ষা করতে রাজি হন না। দ্বিতীয়ত, যাকে পরীক্ষা করছেন 'তাকে' মেডিকেল সার্টিফিকেটের কপি কোনো অবস্থাতেই সরবরাহ করা হয় না। এর কোনো কারণই সুস্পষ্ট নয়। তৃতীয়ত, জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল ছাড়া উপজেলা বা আর কোথাও এই পরীক্ষা করা হয় না।

তবে নির্যাতনের শিকার বা তার পরিবারে কারও হাতে মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করা কেন সম্ভব নয়– এ ধরনের প্রশ্নে ডাক্তারদের স্পষ্ট জবাব হলো : 'আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে?' অর্থাৎ নির্যাতনের শিকার ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট জেনে গেলে, ধরেই নেওয়া হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ডাক্তার নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে যাবেন। তাহলে কে বা কারা এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের নিরাপত্তার জন্য হুমকি, সেটাও স্পষ্ট হওয়া দরকার।

তবে আইন বলছে, মেডিকোলিগ্যাল দায়িত্ব পালন করতে পারেন ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগীয় কর্মকর্তা, জেলা হাসপাতালের আরএমও এবং মেডিকেল অফিসার ও নির্দিষ্ট কর্মকর্তা। সে ক্ষেত্রে মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষা করার যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার উপজেলা পর্যায়ে তো আছেই, এমনকি অনেক ইউনিয়ন পর্যায়েও আছে। উপজেলা পর্যায়ে মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষার উপকরণও আছে। সুতরাং এ জাতীয় পরীক্ষা উপজেলা হাসপাতাল থেকে করে সার্টিফিকেট দিতে আইনি বাধা তো নেই-ই, বরং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা আছে। কিন্তু নির্দেশনা কার্যকর করার কোনো পদক্ষেপ নেই। তবে দেশের সরকারি চিকিৎসালয়গুলোতে, বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে, সাপ্তাহিক ছুটির দিন, অন্যান্য ছুটির দিন এবং কর্মদিবসগুলোতে দুপুর ২টার পর কোনো চিকিৎসক খুঁজে পাওয়া যায় না, মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষা তো দূরের কথা। গ্রাম পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে দূরত্ব, যানবাহন, অর্থ সংকট ইত্যাদি কারণে এবং বহুদূর থেকে জেলা সদরে এসে হাসপাতালে ডাক্তার অনুপস্থিত থাকার কারণে ডাক্তারি পরীক্ষা সময়মতো একেবারেই সম্ভব হয় না। ফলে স্বভাবতই নির্যাতিতা নারী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন এবং অপরাধ উৎসাহিত হয়। আমরা আশা করতে চাই, আইন, নীতিমালা, নির্দেশনা, অবকাঠামো ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতনসহ সব ধরনের নির্যাতন বন্ধে ডাক্তার, পুলিশ সবাই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন। ভিকটিমরা যাতে সঠিক বিচার পান, এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

সিরাজ প্রামাণিক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, আইনগ্রন্থ প্রণেতা ও সম্পাদক-প্রকাশক 'দৈনিক ইন্টারন্যাশনাল'।
seraj.pramanik@gmail.com